ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1172-1178
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.336

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’: ভিন্ন আলোকে

সায়ন মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tarashankar Bandyopadhyay is a renowned figure in Bengali literature. In his fictional works, modernity and tradition coexist in a parallel and often complementary manner. His narratives frequently foreground regionality, elements of folk culture, and the lives and experiences of people from the Rarh region of Bengal. These features are present, to varying degrees, in the novel under discussion as well.

However, the present essay moves beyond these commonly discussed aspects and seeks to explore a particular current within Bengali fiction—namely, the artist-biographical (or artist-novel) tradition. It attempts to examine the nature of the artist's life and the ways in which Tarashankar Bandyopadhyay portrays the life, struggles, and sensibility of the artist within the narrative. The essay also considers how the shadow of the artist Tarashankar Bandyopadhyay himself may be reflected in the novel's central protagonist, and how elements of the author's own creative consciousness resonate through the character. Through this perspective, the study aims to situate the novel within the broader discourse of artist-centered narratives in Bengali fiction.

Keywords: Literary Theory, Fiction, Artist-Biographical Novel, Fictional, Informative, Folk Culture, Tradition

সময় ও সময় স্রোতের ঘটনাবলি সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকের রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনাবলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ আন্দোলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু, বামপন্থী রাজনীতির উত্থান, দাঙ্গা, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও চেতনার প্রতিষ্ঠা, প্রয়োগ প্রভৃতি সমগ্র ভারত তথা বাংলার সামাজিক চেতনাকে নতুন ধারায় বইয়ে নিয়ে চলেছিল। সমাজ ও রাজনীতির একটা গভীর প্রভাব সাহিত্যে পড়ে, উক্ত প্রভাবগুলির পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে এইসময় পাশ্চাত্য দর্শন, চেতনা, শিক্ষার প্রভাব পড়েছিল। এই নতুন স্রোতের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা হয় ‘কল্লোল’ যুগের। দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যুবনাশ্ব প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা ছিলেন এই যুগের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। এই বিশেষ যুগ বাংলা সাহিত্যে নতুন রীতির পরিবর্তন ঘটাল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের কথা আলোচনা করি, প্রথমেই একটি শব্দবন্ধ উঠে আসে ‘তিন বন্দ্যোপাধ্যায়’, যথাক্রমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিন কথাসাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ কল্লোল যুগের হাত ধরেই। অথচ, নিজেদের সাহিত্যগুণে এই তিনজন কথাসাহিত্যিকই একটি বিশেষ রীতির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করেননি, নিজ নিজ রীতির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সে-জন্যই আমরা সাহিত্য আলোচনায় তাঁদের মোটা দাগে চিহ্নিত করার জন্য এক একটি শিরোপা দিয়ে থাকি, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধারণত বলা হয়ে থাকে রাঢ়বঙ্গের কথাকার। প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখা উচিত সাহিত্যে মোটা দাগে বলা কথাগুলি শুধু চিহ্নিতকরণের জন্যই, উক্ত কথাকারদের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা যায় না। যাইহোক আলোচ্য প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় কল্লোল যুগের অন্যতম কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর 'কবি' নামাঙ্কিত উপন্যাসটি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের শুরু কবিতা ও ছড়াচর্চার মাধ্যমেই, সেকথা আমরা তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' রচনাতেই পাই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রথম জীবনে কংগ্রেসী রাজনীতি ও স্বদেশ মুক্তির আন্দোলনে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন সেকথাও উক্ত রচনাতেই আছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে সাহিত্যজীবনে প্রবেশ সম্পর্কে তিনি জানাচ্ছেন—

> "আমার সাহিত্য জীবনের শুরু কোনখান থেকে করব সে নিয়ে আমার মনে কোনও অস্পষ্টতা নেই। এই শুরুটি জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবেই ঘটেছিল। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে দিন জেলখানা থেকে বের হলাম সেই দিনই মনে মনে এ সংকল্প করেছিলাম। ...এবং তখন জেলখানায় রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি; চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে তখন রাজনীতির দিকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়েছে।"[১]

অর্থাৎ, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসছেন, কিন্তু তিনি আজীবন থেকেছেন রাজনীতি ও সমাজ সচেতন, তাঁর রচিত উপন্যাস, ছোটগল্প, রিপোর্টাজধর্মী লেখা 'গ্রামের চিঠি' তার সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য উপন্যাস 'কবি'-তেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন বহু রয়েছে। আঞ্চলিকতা— রাঢ়ের প্রকৃতি, সমাজ, মানুষ, লোকজ উপাদান— কবিগান, ঝুমুর গান প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে এই উপন্যাসের বিচার সম্ভব। কিন্তু এসব বাদেও এই উপন্যাসটিকে একটি ভিন্ন আলোকে আলোচনা করা যেতে পারে। জার্মান ভাষায় একটি শব্দ আছে বিলডুংসরোমান (Bildungsroman) অর্থাৎ আত্মজীবনীমূলক রচনা, এই জঁরের একটি উপবিভাগ ক্যুনসটলাররোমান (Künstlerroman) অর্থাৎ শিল্পীজীবনী মূলক উপন্যাস।[২] পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই ধরনের রচনার উদাহরণ— James Joyce রচিত A Portrait of the artist as a Young Man, Thomas Mann রচিত Dr Faustus, Romain Rolland রচিত John Christopher ইত্যাদি। এই ধরনের রচনার বা উক্ত উপন্যাসগুলির যা বৈশিষ্ট্য সেটি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য সেই বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠতে পারে। তবে শিল্পীজীবনীমূলক উপন্যাস যে বাংলা সাহিত্যে বিরল নয় এবং তার নিজের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা নিয়ে দ্বিরুক্তি নেই। বর্তমান প্রবন্ধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসটিকে এই বিশেষ জঁর আলোকে দেখার চেষ্টা করব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের বীজতলা তাঁর ছোটগল্পের জগৎ। 'কবি' উপন্যাসটি এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়, 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় একই শিরোনামে একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, উপন্যাসের প্রারম্ভের কাহিনি অংশই গল্পের কাহিনি, যদিও গল্পের শেষ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রসঙ্গত, গল্পের প্রোটাগনিস্ট ও উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট এক হলেও গল্পে তার শিল্পী সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি, ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেটা বোধহয় সম্ভবও নয়। যাইহোক আমরা এবার উপন্যাসের কাহিনির একটা সরল সংক্ষেপ আলোচনা করতে পারি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসের

কাহিনির পটভূমিও রাঢ়বঙ্গ। রাঢ়বঙ্গের বর্ণাশ্রমের নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত ডোম জাতির ঘরে জন্ম এই কাহিনির প্রোটাগনিস্ট নিতাইয়ের। তার পিতামহ ঠ্যাঙাড়ে, বাপ সিঁধেল চোর, মাতামহ ও মামা দুজনেই নামকরা ডাকাত। কাহিনির শুরুতেই জানা যায় তার মামা 'বীরবংশী অথবা গৌর ডোম' বছরখানেক পূর্বেই কালাপানির সাজা কেটে ফিরেছে। এহেন বংশে, পরিবেশে নিতাই সম্পূর্ণ বিপরীত। ডাকাতি, ঠ্যাঙাড়ে বৃত্তি দূর অস্ত, চৌর্যবৃত্তিরও বিরোধী নিতাই। এমনকি এসবের জন্য ঘর, জীবিকা ছাড়তেও দ্বিধা করেনি সে। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ তার, নৈশ স্কুলে যতদিন সম্ভব পড়াশোনা করেছে, যেখানে পড়ার সামগ্রী পেয়েছে সংগ্রহ করেছে, এমনকি পড়ে পাওয়া ছাপার অক্ষরের কাগজও উৎসাহের সঙ্গে যত্নে রেখেছে নিজের সংগ্রহে। গ্রামে গ্রামে কবিগানের আসরে ঘুরেছে, অশ্লীল কবিগানের থেকে তার পছন্দ তারণ মণ্ডলের সুষ্ঠু, অশ্লীলতা বর্জিত কবিগান, তাকেই সেই দ্রোণাচার্য মেনেছে মনে মনে। নিতাইয়ের ইচ্ছে সে বড় কবিয়াল হবে একদিন। কবির জগতে প্রবেশের সুযোগও একদিন হঠাৎ করে চলে আসে তার সামনে এবং নিজগুণে সেই সুযোগের সম্পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করে সে। নিজের কবিসত্তাকে উন্মোচিত করে জনসমক্ষে। আসরের মূল কবিয়াল থেকে পৃষ্ঠপোষক বাবুরা সকলেই উচ্চকিত প্রশংসায় ভরিয়ে দেয় তাকে। বন্ধু রাজন থেকে ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণাদাত্রী ঠাকুরঝি সকলেই বিস্মিত হয় তার এই শৈল্পিক প্রতিভায়। নিতাইয়ের স্বপ্নের গন্তব্যের যাত্রা শুরু হয়। পূর্বেই নিতাই নিজেকে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুত করেছিল শিল্পসাধনার জন্য, সেই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয় এই ঘটনার পর। এরপর আমরা দেখি ধীরে ধীরে বহু বাঁধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নিতাইয়ের শিল্পী হয়ে ওঠার যাত্রা। সে কুলিগিরির কাজে ইস্তফা দেয়, তার জীবনে ঠাকুরঝির অস্তিত্ব দেখা দেয় ভিন্ন মাত্রায়, এসবের মধ্যেই তার জীবনে শুরু হয় বসন কাণ্ড। কবির লড়াইয়ে দোয়ারকি হিসাবে ডাকা পাওয়া, কৃচ্ছ্রসাধানায় জীবন অতিবাহিত করা, ঠাকুরঝির সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়েই তার জীবনে শুরু হয় বসন অধ্যায়ের। গ্রামে আসে ঝুমুর দল, সেই ঝুমুর দলের প্রধান নৃত্যশিল্পী বসন ওরফে বসন্ত। এই নৃত্য পটিয়সী নারী একধারে যেমন ঝুমুর দলের বড় মানের শিল্পী, আরেকদিকে তার রূপের আলোর নীচে অন্ধকারের মতো দেহ ব্যবসার জীবন রয়েছে। এই বসন্তের সঙ্গেই নিতাইয়ের গড়ে ওঠে প্রণয়ের সম্পর্ক। উৎসবের শেষে ঝুমুর দল বিদায় নেয়, নিতাই-ঠাকুরঝি সম্পর্কে ভাঙন ঘটে যায়। সে-সময়েই ঝুমুর দলের ডাকে অথবা বসন্তের আকর্ষণে গ্রাম, বন্ধু রাজন, ঠাকুরঝিকে পিছনে ফেলে নিতাই পাড়ি দেয় ভিন্ন এক যাত্রায়। সেটা যদিও তার শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরই। নিতাইয়ের জীবনে বসন্ত অধ্যায় প্রণয়, সম্পর্কের টানাপোড়েন, সামাজিক অন্ধকার, ঝুমুর দলের লোকজ সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ কবিয়াল হয়ে ওঠার পর্ব। জীবন তার কাছে নতুন নতুন আঙ্গিকে ধরা দিলেও শিল্প সাধনা থেমে থাকে না। বরং শিল্পের শ্লীলতা, অশ্লীলতাকে সে নিজগুণে প্রয়োজনমতো পৃথক করে রূপ দিতে পারে। এরপর বসন্তের অকাল মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শেষ হয় নিতাইয়ের জীবনের এই অধ্যায়ও। বসন্তের মৃত্যু নিতাইকে কিছুটা বিবাগী করে তোলে, ঝুমুর দল ছেড়ে সে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু নিতাইয়ের সংক্ষিপ্ত কাশীবাস তার বিরহ ক্ষতের উপরে প্রলেপ লাগাতে পারে না, নিজের দেশের স্মৃতি বারংবার তার মনে জেগে ওঠে, সে উপলব্ধি করে এই বিদেশবাস, এই বৈরাগ্যের দেশ তার জন্য নয়, নিজের দেশের প্রকৃতি, ভাষা আসল, সে অভাব কোনওভাবেই পূরণ করা যাবে না। নিতাই আবার ফিরে আসে নিজের দেশে, নিজের মানুষের কাছে, নিজের ধুলোমাটিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে যখন বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয় তার পূর্বেই বাংলাভাষায় উপন্যাস শিল্প নিয়ে অল্পবিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে গেছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কলমে বাংলা উপন্যাস বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং স্রষ্টার ছায়া নিয়ে। বর্তমান সময়েও সেই ধারা চলে আসছে ক্রমাগত। শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন

কথাসাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছেন তখন বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়ে গেছে, সেই যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল সাহিত্যে বাস্তবতার প্রাবাল্য, চরিত্রের মনের বিশ্লেষণের মতো বিভিন্ন বিষয়, এমনকি কথন প্রণালীতেও বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়। একজন ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাস লেখেন তখন উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের ছায়া দেখা যায়। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' উপন্যাসের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্বাসের একটি ছবি ধরা পড়ে। 'শিবনাথ' চরিত্রটি যেন তাঁরই সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় পুষ্ট। ঠিক এই সূত্র ধরেই আমরা যদি 'কবি' উপন্যাসের নিতাই চরিত্রের আলোচনা করি তবে দেখব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার গভীর ছায়া পড়েছে এই চরিত্রে। একজন শিল্পী যখন আরেকজন কাল্পনিক শিল্পীর জীবন কাহিনি লিখছেন তখন এই ধরনের ছায়াপাত অবশ্যম্ভাবী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে রাঢ়বঙ্গের মানুষ, চিরটাকাল সেখানেই কাটিয়েছেন, সেখানকার সমাজ, প্রকৃতি, লোকজ উপাদান তাঁর নখদর্পণে। ঠিক এই পটভূমিতেই এইসব উপাদানের মধ্যেই রয়েছেন উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট নিতাই কবিয়াল, তার শিল্পীসত্তার জন্যও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বেছে নিচ্ছেন রাঢ়ের বহুল জনপ্রিয় একটি শিল্প মাধ্যমকে। কবিগান বাংলার লোকশিল্পের অন্তর্গত একটি শিল্প মাধ্যম, এই মাধ্যম যেমন বাংলার গ্রামীণ খেটে খাওয়া বর্ণাশ্রমের নীচের সারির মানুষের কাছের, তেমনই এই মাধ্যমটির মধ্যে ধরা আছে দেশীয় ঐতিহ্য। এই সূত্রে এই বাংলার বিশিষ্ট কবিয়াল বিজয় সরকারের একটি গানের কথা উল্লেখ করলে বোধহয় বিষয়টি স্পষ্ট হয়— "বাদল বাউল মেতেছে তার প্রাণের গান গেয়ে,/ ধানের খেতে নাচিছে এক দুলালী মেয়ে/ সবুজ ভরা যৌবন অঙ্গে/ কবে মিলিবে সোনালি রঙ্গে"।[৩] এই গানের পঙ্‌ক্তি থেকেই বোঝা যায় কবিয়ালরা বঙ্গদেশকে কোন অবস্থান থেকে চেনেন এবং কীভাবে সেই দেখা ছড়িয়ে দেন। লোকজ সংস্কৃতি, দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় এই কারণেই নিতাই কবিয়ালের জন্য এই শিল্প মাধ্যম বেছে নেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণাশ্রম প্রথা মানতেন কিনা জানা নেই। কিন্তু তিনি নিজের সমাজ ও শ্রেণির কলুষতা, অন্ধকার দিকগুলোকে সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে গেছেন এবং সমালোচনাও করেছেন। অপরদিকে নিতাই কবিয়াল নিজেকে সমাজচ্যুত করেছিল শুধু সৃষ্টিশীলতার পথে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়; বরং সে নিজের সমাজের অপরাধপ্রবণতার দিকগুলিকে মানতে পারেনি বলেই। নিতাই কবিয়াল যদি নিজেকে জাতিগত উদ্ধারের প্রক্রিয়াতে নিয়ে যেত তবে পরবর্তীকালে বারংবার নিজের জাতের কথা স্বীকার করত না। বরং বিপ্রপদ-র অপমানের জবাবে তার মধ্যে কিছুটা জাত্যাভিমানও বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়। এর মূল কারণ হিসাবে বলা যায় সে কখনও নিজের শিকড়কে অস্বীকার করেনি। এই দিকটিও কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজের শিকড় অস্বীকার করেননি, অহংকারও করেননি। পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল কবিতার মাধ্যমে এবং সেই প্রক্রিয়া তাঁর ক্ষেত্রে খুব একটা সুখকর হয়নি। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি গান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের রচিত, তিনি কোনও জায়গা থেকে ধার করেননি। সুতরাং, এই উপন্যাস রচনার মাধ্যমে নিজের এক অপূর্ণ সাধ পূরণ করবার প্রচেষ্টা করেননি বলে আমরা মেনে নেব? এছাড়া ঔপন্যাসিকের নিজের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> "সাহিত্যকে অবলম্বন করেই কোনোক্রমে দিন যাপন করে চলেছি। মধ্যে মধ্যে ভাবি কেন লিখি? প্রতিষ্ঠার লোভ? সম্মানের লোভ? সম্মানের মোহ? কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারি না। এর মধ্যে আরও কিছু পেয়েছি। আনন্দ তো বটেই। আনন্দ কিন্তু প্রতিষ্ঠাতেও আছে,

> সম্মানেও আছে। আনন্দের অতিরিক্তও কিছু পেয়েছি। এর ফলে পেয়েছি দুঃখ শোককে সহ্য করবার শক্তি।"[৪]

উপন্যাসের কাহিনি ভালভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে নিতাই কবিয়ালের শিল্প সাধনার যাত্রা এভাবেই পরিণতিতে পৌঁছেছে। মিলিয়ে দেখতে গেলে শিল্পীর সৃষ্ট শিল্পীর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ না হলেও বিশেষ কিছু সামঞ্জস্য ধরা পড়বেই।

প্রবন্ধের শুরুর দিকে দুটি জার্মান শব্দের কথা উল্লেখ করেছিলাম, একটি 'বিলডুংসরোমান' (Bildungsroman), অপরটি 'ক্যুনসটলাররোমান' (Künstlerroman)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও নিতাই কবিয়ালের জীবনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রথম শব্দটি বা ওই ধারার সঙ্গে বর্তমান উপন্যাসের সংযোগ কিছুটা বোঝানো গেল। এবার আসা যাক দ্বিতীয় শব্দ বা ধারার কাছে, অর্থাৎ শিল্পী জীবনীমূলক আখ্যানের ক্ষেত্রে। আমরা জানি শিল্পী মাত্রই তিনি সাধারণ মানুষের থেকে তিনি আলাদা হবেন, সেটা শুধু সৃষ্টি করছেন বলে নয়, বরং সৃষ্টির পিছনে যে বিশেষ কর্মকাণ্ড রয়েছে তার জন্য। অথচ, একজন শিল্পী ও একজন সাধারণ মানুষ একই সমাজের অন্তর্গত, কেউ জন্মাবার পরেই শিল্পী হয়ে ওঠেন না। এই সৃষ্টিশীল মন বা শিল্পী মনকে চিহ্নিত করার জন্য কয়েকটি বিষয়কে আমরা লক্ষ করতে পারি। প্রথমত, খুব অল্প বয়স থেকেই জানার ও জ্ঞানের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ। দ্বিতীয়ত, যা জানছি, যা দেখছি তার সঙ্গে কল্পনা শক্তি মিশিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করার প্রবণতা। তৃতীয়ত, ধীরে ধীরে নিজেকে সমাজ ও সাধারণ থেকে বিচ্যুত করে ফেলা (Isolate)। চতুর্থত, সংবেদনশীলতা। পঞ্চমত, জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, যন্ত্রণাকে সৃষ্টির অনুঘটক হিসাবে কাজে লাগানো। ষষ্ঠত, সৃষ্টিশীলতার পথে একাগ্র থাকা। এছাড়া, সততা, শিল্পের সঙ্গে অশ্লীলতা না মিশিয়ে তাকে শাশ্বত রাখার প্রবণতা প্রভৃত। বস্তুত, কোনও সৃষ্টিশীল মানুষ এই মাপকাঠি মেনেই যে সৃষ্টিশীল হবেন এই দাবি করা যায় না। কিন্তু আলোচনার স্বার্থে এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা ধরতে পারি। এবার দেখা যেতে পারি নিতাই কবিয়ালের জীবন নির্মাণে এই বিষয়গুলি কতটা ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাস কাহিনির প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে নিতাই জাতিতে ডোম ও তার পূর্বপুরুষ সকলেই চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কর্মের সঙ্গে। আরেকটু বিশদে বললে তাদের পুরো সমাজটাই। এহেন সমাজ ও পরিবারের নিতাইয়ের প্রথম থেকেই জানার প্রতি আগ্রহ ও বিশেষ যত্ন। যেখানে আঁধার নামলে তার সমাজের অধিকাংশ নিঃশব্দ পদসঞ্চরণে জীবিকার উদ্দেশ্যে বের হয়, সেখানে নিতাইচরণ রোজ সন্ধ্যায় বইয়ের দপ্তর বগলে নাইট স্কুলে যায়। নিতাইয়ের সঙ্গে ডোমপাড়ার অনেক ছেলেই এই নৈশ স্কুলে ভর্তি হলেও পরবর্তীতে পালিয়ে যায়, নিতাই শুধু থেকে যায় এবং পরীক্ষাতে ফার্স্টও হয়। নাইট স্কুলে চার দফায় পুরস্কৃত হওয়ার পরও নিতাই দুই বছর পাঠশালায় ভর্তি হয়। ঔপন্যাসিক বলছেন—

> "ততদিনে তাহার বিদ্যানুরাগ আর এক পথে শাখা বিস্তার করিয়াছে। এ দেশে কবিগানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।... নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ। পুরাণ-কাহিনী, কবিতার ছন্দমিল এবং উপস্থিত বুদ্ধির চমক দেওয়া কৌতুকও তাহার ভাল লাগে।"[৫]

অর্থাৎ, বোঝা যায় নিতাইয়ের এই বিদ্যানুরাগ শুধু পুরস্কারপ্রাপ্তি, উপহার পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সে জানতে চাইছে, শিখতে চাইছে। শুধু এটুকুই নয় পরবর্তীতে কাহিনিতে আমরা বারংবার দেখি নিতাইয়ের এই বিদ্যানুরাগ, নিতাই যখন যা ছাপার অক্ষরে পেয়েছে পরম ভক্তিতে সংগ্রহ করেছে। এমনকি যখন সে ঝুমুর দলের কবিয়াল তখন ঝুমুর দলের কর্ত্রীর মুখ থেকে শুনেছে গল্প এবং কলকাতা থেকে ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল, দাশু রায়ের পাঁচালী আনিয়েছে, প্রিয়তমা বসন্তের কাছে আগ্রহ ভরে শিখতে চেয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি। কাহিনির শুরুতে আমরা যে নিতাইয়ের বিদ্যানুরাগ দেখি তার শেষ পর্যন্ত একইরকম থাকে। তবে

নিতাই যে শুধু শিখছে এমন নয়, যা শিখেছে তার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সৃষ্টি করেছে, সে মহাদেবের দলের সঙ্গে প্রথম কবির লড়াইয়ে হোক, কিংবা 'ঠাকুরঝি'কে 'রাজা' কালো বলার কারণে মুখে মুখে গান বানানো হোক, অথবা রাজার ছেলেকে 'যোবরাজ' অভিধায় ভূষিত করার জন্যই হোক।

কাহিনিতে নিতাইয়ের সমাজচ্যুত হওয়ার বিষয়টিও রয়েছে ভীষণ স্পষ্টভাবে। নিতাই যখন যে পরিবেশে থেকেছে নিজের চারিপাশে যেন একটা অদৃশ্য দেওয়াল রেখেছে, যেখানে প্রবেশের অধিকার গুটিকয়েক মানুষের। প্রথমত, শুধু শিল্পসাধনার জন্যই নিতাই নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্যুত করে। তারপর সমাজ থেকে নিজেকে আলাদা করে যখন বন্ধু রাজার সাহয্যে স্টেশনের কাছে আসে এবং একটি ঘর বেছে নিয়ে নিজেকে যেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন রাখে। স্টেশনের কাছে নিতাইয়ের বসবাসের ঘরটি ঔপন্যাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী যদি পাঠক যদি কল্পনা করে নেন, তবে বুঝতে পারবেন ঐ ঘরটির আশেপাশে আছে রাজার বাসস্থান ও বণিক মাতুলের দোকান। সে দুটিও নিতান্ত এক চৌহদ্দিতে নয়। ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকবার সময়েও সে নিজেকে আলগোছে রেখেছে দলটির সঙ্গে, প্রিয়তমা বসন্তের জন্য দলের সঙ্গে থেকে গেলেও দলের সবার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেনি, বরং দল থেকেও সবাইকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। ঝুমুর দলের প্রধানকর্ত্রী মাসি নিতাই সম্পর্কে তাই উপলব্ধি করে—

> "এই লোকটি তাহার আনুগত্য কোনদিন স্বীকার করে নাই এবং আজও সে যে তাহাকে লঙ্ঘন করিল তাহারও মধ্যে রূঢ় কিছু নাই, উদ্ধত কিছু নাই, অস্বাভাবিকও কিছু নাই। নিতাই কোনমতেই তাহার কোন অপমান করে নাই।"[৬]

নিতাইয়ের জীবনে দুঃখ, যন্ত্রণা বারংবার এসেছে এবং সেসব যন্ত্রণা তার শিল্পী হওয়ার পথে অন্তরায় না হয়ে পাথেয় হয়েছে বলা চলে। কবিগানে এঁটোপাতার অপবাদ, বিপ্রপদ-র 'কপিবর' বলার মতো অপমান, বিদ্যানুরাগের জন্য নিজের সমাজের থেকে পাওয়া পণ্ডিত বিদ্রুপ, কবিগানের আসরে সম্মান পেলেও মামার হাতে প্রহৃত হওয়া, বহুবার বহুরকমভাবে অপমানিত হতে হয়েছে নিতাইকে। সাধারণ মানুষের জীবনে যে অপমান আসে না এমন নয়, কিন্তু নিতাই অপমানে দগ্ধ হয়েছে, জারিত হয়েছে, নিজেকে প্রস্তুত করেছে যোগ্য জবাব দেবার জন্য। তবে নিতাইয়ের সবথেকে বড় যন্ত্রণাময় অধ্যায় সম্ভবত দুটি, একটি ঠাকুরঝির অমিলন ভালবাসা হারানো। দ্বিতীয়ত, প্রিয়তমা বসন্তের মৃত্যু। নিতাইয়ের কবি জীবনের প্রথম অংশে ঠাকুরঝি একাধারে ভক্ত, অনুপ্রেরণাদাত্রী ও ভালবাসার মানুষ। নিতাই সমাজ, সংসার ভুলে কোন ক্ষণে ঠাকুরঝিকে ভালবেসে ফেলে, অথচ এই ভালবাসা পরিণতি পাবার আগেই ঝরে যায়। নিতাই একরকম এই দুঃখে নিজের গ্রাম ছাড়ে। দ্বিতীয়ত, ঠাকুরঝি অধ্যায় শেষ হবার আগেই নিতাইয়ের জীবনে আসে বসন্ত, বসন্তের সঙ্গে ধীরে ধীরে এক গভীর প্রণয়ের সৃষ্টি হয়। বসন্তের গুপ্ত কাশরোগ, তার জীবিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেও বসন্তকে নিজের করে নেয় নিতাই, গাঁটছড়া বাঁধে তার সঙ্গে। যেন সবকিছু জেনেই যন্ত্রণার সঙ্গে আলিঙ্গন করে নিতাই। বসন্তের মৃত্যু নিতাইয়ের জীবনে গভীর যন্ত্রণা হয়ে নেমে আসে, একরকম বৈরাগ্যে নিয়ে যায় তাকে। যদিও নিতাই নিজের সৃষ্টিশীল সত্তা অথবা নিয়তির কারণেই ফিরে আসে পুরানো গ্রামে, যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক যন্ত্রণার সংবাদ— ঠাকুরঝির মৃত্যু। আমরা যদি বাস্তবের শিল্পীদের জীবন কাহিনির দিকে ফিরে তাকায়, দেশ থেকে বিদেশ, সবরকম ও সমস্ত শিল্পীদের জীবনে ট্রমা, দুঃখ, যন্ত্রণা একটি সাধারণ গুণনীয়ক। সে অন্ধ সঙ্গীতশিল্পী মোৎজার্ট হোক বা চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগ অথবা আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, মির্জা গালিব। এই সারণী শেষ হবার নয়, পৃথিবীব্যাপী শিল্পীদের জীবনে দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা যেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শিল্প সৃষ্টিতে অনুঘটক। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট নিতাই কবিয়াল এই বিষয় থেকে ছাড় পাবে কি করে?

কবিয়াল নিতাইয়ের জীবন ঘটনাবহুল, কাহিনিতে নিতাইয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনের কথা ঔপন্যাসিক বিশেষ বলেননি। জীবনের বহু ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে নিতাই এগিয়েছে, অপমান, লাঞ্ছনা, প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রণা, দারিদ্র্য। কিন্তু নিতাই একজন কবি হওয়ার লক্ষ্যে অবিচল থেকে শেষ পর্যন্ত, তার শিল্প সাধনায় সে একাগ্র। হয়তো ঝুমুর দলে এসে পেট চালানোর জন্য অথবা দলের সামগ্রিক দাবিতে সে মদ্যপান করে উগ্র রূপ ধরেছে, কবিগানের সভায় অশ্লীল হয়েছে কিন্তু নিজস্ব সাধনা চালিয়ে গেছে সমান্তরালে।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য[৭] ও অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার[৮]-এর মতো বিদ্বজনেরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' দ্বৈত উপন্যাসের অপুকে কেন্দ্র করে বিলডুংসরোমান (Bildungsroman) ও ক্যুনসটলাররোমান (Künstlerroman) তত্ত্বের বঙ্গীয় রূপের কথা উল্লেখ করেছেন। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে ওই দ্বৈত উপন্যাসের মতো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' মহাকাব্যিক নয় এবং বিস্তারিতও নয়। ওই দ্বৈত উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপুকে যেমন শৈশব থেকে গড়ে তোলেন, বিভিন্ন উপকাহিনিতে চারপাশ ভরে রাখেন এই উপন্যাসে তেমনটা নেই। কিন্তু একজন শিল্পীর জীবন গড়ে তোলার যথেষ্ট রসদ রয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপুর পাঁচালী বাংলা কথাসাহিত্যে এক রকম বিরল একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব কবিজীবনী বা সৃষ্টিশীল জীবনীমূলক উপন্যাসের অভাব নেই, বুদ্ধদেব বসুর 'মৌলিনাথ', মহাশ্বেতা দেবী রচিত 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' প্রভৃতি উপন্যাস রয়েছে। এই উপন্যাসগুলির আখ্যানের প্রবণতা অন্য কিছু হলেও এই উপন্যাসগুলির মধ্যে শিল্পীজীবন গড়ার প্রবণতা বিদ্যমান। তেমনই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসকে আঞ্চলিকতা, লোকজ উপাদান সমৃদ্ধ উপন্যাসের বাইরে গিয়ে ভিন্ন আলোকেও দেখা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। আমার সাহিত্য জীবন। বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ. ১০।
২. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। চিরায়ত প্রকাশন, ভাদ্র ১৪২০, পৃ. ৫৫।
৩. হক, মৃদুল ও দত্ত, সঞ্চিতা (সম্পাঃ)। পড়শি। 'বিজয় সরকার সংখ্যা'। দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শরৎ ১৪২৯, পৃ. ৬৭।
৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ও বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাঃ)। কেন লিখি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৌষ ১৪০৬, পৃ. ১৫-১৬।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। কবি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪২৯, পৃ. ১৬।
৬. তদেব, পৃ. ১৪২
৭. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। চিরায়ত প্রকাশন, ভাদ্র ১৪২০, পৃ. ৫৫-৬৭।
৮. সিকদার, অশ্রুকুমার। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। অরুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৩৯৫, পৃ. ৯৫-১১০।